যুব সমাজের প্রতি

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

যুব সমাজের প্রতি — শিবদাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১১ জুন, ১৯৭৩
২১তম মুদ্রণ ঃ ৫ আগস্ট, ২০১৪
২২তম মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, ২০১৫
২৩তম মুদ্রণ ঃ ৫ মে, ২০১৬
২৪তম মুদ্রণ ঃ ৫ অক্টোবর, ২০২১
২৫তম মুদ্রণ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **১৫ টাকা**

প্রকাশকের কথা

১৯৬৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ডেমোক্র্যাটিক ইউথ অর্গানাইজেশনের (ডি ওয়াই ও-র) প্রথম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, আমাদের প্রিয়তম নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ 'বর্তমান যুব সমাজ ও আমাদের কর্তব্য' সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। যেসব সমস্যা এদেশের যুবসমাজকে জর্জরিত করে রেখেছে এবং যুব আন্দোলনগুলির সামনে যেসব সঙ্কট এবং জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেসব থেকে উত্তরণের সঠিক পথনির্দেশ এই ভাষণটির মধ্যে রয়েছে।

এই ভাষণটি প্রথমে ডি ওয়াই ও-র মুখপত্র 'যুবসংস্কৃতি'র অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭০ সালের মে মাসে 'পথিকৃৎ' পত্রিকা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' নামক প্রবন্ধ সংকলনে ভাষণটি 'যুব সমাজের প্রতি' নাম দিয়ে প্রকাশ করে। যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় পথনির্দেশক হিসাবে এই ভাষণটির যে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষণটিকে সহজলভ্য করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১১ই জুন প্রথম এটি আলাদা করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয় এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে এর ২৪টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে পুস্তিকাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে পুস্তিকাটির ২৫তম মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

যুব সমাজের প্রতি

আপনারা গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের এই বার্ষিক সম্মেলনে বর্তমান ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার যা পরিস্থিতি, তাতে যুবসম্প্রদায়ের সামনে সমস্যা কী, এবং তাদের করণীয় কী — সে সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন। প্রথমত, যুবসমস্যা গোটা সমাজের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একটি আলাদা সমস্যা নয় — অন্তত আমি তাই মনে করি। কাজেই যুবসমাজের সমস্যা, বা যুব আন্দোলনগুলোর সামনে যে সমস্যা তা সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের সমাজের একটা সাধারণ রূপরেখা — অর্থাৎ বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা সামনে থাকা দরকার। কারণ, একমাত্র তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সঠিকভাবে যুবসমস্যাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হব বলে আমি মনে করি।

বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলায় এবং শুধু পশ্চিমবাংলায় কেন, গোটা ভারতবর্ষের গণআন্দোলনগুলো আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আন্দোলন এদেশে হয়নি তা নয়, যুব আন্দোলনও এদেশে হয়নি এমনও নয় — বহুবার হয়েছে এবং অনেক সময় যুব আন্দোলনের বন্যায় এ দেশ ভেসে গেছে — কিন্তু, তবু গোটা দেশের যুবসমাজের সামনে মূল সমস্যাগুলো যা ছিল, দেশের সামনে সমস্যাগুলো যা ছিল তার কোন সমাধান তো হয়ইনি, উপরন্তু তা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যুব আন্দোলন পূর্বেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। আপনাদের মতো সংগঠন এদেশে আগেও অনেকবার গড়ার চেষ্টা হয়েছে, ভবিষ্যতে বা এখনই হয়তো আরও গড়ে

উঠবে। কিন্তু, যে সমস্যাটা আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাইছি তা যদি আপনারা না ধরতে পারেন, তাহলে অতীতের বহু আন্দোলনের মতোই এ আন্দোলনেরও পরিণতি হয়তো কিছু সাময়িক লাভ বা সাময়িক লোকসানের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যাবে।

গোটা ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজটাকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে দেখব, তার রাজনৈতিক দিকটা এইরকম — ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে যেভাবেই হোক্ দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা কী রকমের হয়েছে, স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কী রকমের দাঁড়িয়েছে — এ সম্বন্ধে মতপার্থক্য থাকতে পারে। সে সম্বন্ধেও আমি অবশ্যই আমার কিছু বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখব। কিন্তু, একটা ব্যাপারে আমি মনে করি বোধহয় বিশেষ কোন দ্বিমত নেই যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। অথচ, স্বাধীনতার পর যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, এটা অবিসংবাদিতভাবে সত্য কথা যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের যে মূল একটা লক্ষ্য ছিল গণমুক্তি — দেশের জনসাধারণের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি — দেশের এ ধরনের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে তা অপূরিত রয়ে গেছে। কোনমতেই এ সত্যকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। শোষণের রূপ কী — এ নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু, শোষণ-জুলুম-অত্যাচারী শাসন যে জগদ্দল পাথরের মতো ভারতবর্ষের সমাজের ওপর চেপে বসেছে এবং তা যে ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সমস্ত নীতিগুলোকে এবং আচার-ব্যবহারগুলোকে পরিচালিত করছে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত কোন প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে, জনতার সাথে যারা চলতে চায় তাদের মধ্যে নেই। মতপার্থক্য এইখানে যে, শোষণের চরিত্রটা কী ?

আমি প্রথমেই যুব আন্দোলন ও তার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী — সে সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করে নিতে চাই। এইজন্যই করে নিতে চাই যে, যুব আন্দোলন, তার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-আদর্শবাদের চর্চা — এ সবের কোন মানে নেই যদি তার একটা বাস্তব কার্যকারিতা জীবনের ওপর, সামাজিক আন্দোলনের ওপর, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর, দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ওপর না পড়ে। অর্থাৎ, আমরা মহা সংস্কৃতিবান, আমরা অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করি — কিন্তু জীবনে তার

কোন প্রতিক্রিয়া নেই, জীবনকে তা উন্নত হতে ও পরিবর্তিত করতে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না — এ ধরনের যুব ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হচ্ছে এক ধরনের ড্রইংরুমের সাজানো আড্ডা, বা গল্পগুজবের বিষয়বস্তু, বা মাঝে মাঝে দু-চারটা কাগজ, পত্রপত্রিকা পড়ে নিজেদের মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করার একটা উপায় মাত্র। এই যদি আন্দোলনগুলির বা সংস্কৃতি চর্চার বা সংগঠন গড়ে তোলার বা যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয় — আমি বলব, সে আন্দোলন গুটিয়ে ফেলাই ভাল। সে আন্দোলনে এ দেশের কোন উপকার হবে না।

স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষালাভের আর কোন মানে নেই ? আমি মনে করি, নিছক আত্মতৃপ্তির জন্য জ্ঞানচর্চা ও উদ্দেশ্যহীন শিক্ষালাভের কোন মানে নেই, একমাত্র প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা ছাড়া। জনস্বার্থ ও প্রগতির অর্থে শিক্ষার একটি মাত্রই মানে, জ্ঞান অর্জনের একটিই যথার্থ মানে — তা হচ্ছে জীবনে তার প্রয়োগ। জীবনকে তা ঠিকভাবে প্রভাবিত করবে। আমার আপনার চরিত্রকে তা প্রভাবিত করবে। সমাজের অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন শ্রেণীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে সেই লড়াইয়ের চরিত্র নির্ণয় করতে শেখাবে। তার ফলে দেশের গোটা আন্দোলন এবং সমস্যাগুলোর সাথে আমাকে জড়িত করতে — কীভাবে আমি জড়িত করতে পারি নিজেকে, কী ভাবে এবং কোন্ শ্রেণীর আন্দোলনের আমি অগ্রগামী অংশ হতে পারি — তা শেখাবে। কারণ, আমি সামাজিক মানুষ, আমি সমাজেরই একজন। সমাজ পচে গেলে ক্ষয়ে গেলে গোটা মানবসমাজের ক্ষতি, সাথে সাথে আমারও ক্ষতি। ফলে সমাজে সমস্যা কী, সমাজ কেন অধোগতির দিকে নেমে যাচ্ছে — সে সব নিয়ে যদি যুবকরা মাথা না ঘামান, এ ব্যাপারে যদি তাদের কোন দায়িত্ববোধ না থাকে, এ ব্যাপারে যদি তাদের কোন করণীয় কাজ না থাকে — তাদের কাজ যদি হয় সমাজ অভ্যন্তরের শ্রেণীসংগ্রামগুলো এবং সমস্ত রকমের সামাজিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কচ্যুত শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, তাহলে আমি বলব, তা জ্ঞানতত্ত্বের বা জ্ঞানসাধনার নামে ভাঁড়ামি। প্রতিক্রিয়াশীলরা বা সমাজের পরগাছা সম্প্রদায় বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা বলে একে যত তারিফই করুক না কেন, আসলে তা জ্ঞানচর্চা নয়। শুনতে ভাল এরকম অনেক বড় বড় কথা এর পেছনে থাকতে পারে, অনেক চটকদার আলোচনা তাঁরা করতে পারেন — কিন্তু যাঁরা গণআন্দোলন ও জনজীবনকে প্রভাবিত করেন না এবং আন্দোলনগুলোর সামনে আসেন না, সামাজিক সমস্যা যাদের মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না, সমাজপ্রগতির ভাবনা যাদের আহার-নিদ্রা কেড়ে নেয়

না, তেমন সংস্কৃতিবানদের কাছ থেকে আপনারা দূরে থাকবেন। এ আমার একটা একান্ত অনুরোধ আপনাদের কাছে। আমরা তাই একথাটা যেন সবসময় মনে রাখি যে, সংগঠন, যুব আন্দোলন, যুবকদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন — এসব কথার কোন মানে নেই যদি যুবকরা গোটা দেশের মূল সমস্যা কী, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের করণীয় কাজ কী — এটা সঠিকভাবে নির্ধারিত করতে না পারেন। কারণ, তা না হলে জ্ঞান চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা — এসবই একটা শখ, বিলাসিতা, অযথা সময় নষ্ট এবং লোকঠকানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

এখন গোটা ভারতবর্ষের একটা নক্‌শা, আমি যতটুকু বুঝেছি, অল্প কথায় তা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ছিল — অর্থাৎ সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, জনগণের কল্যাণের অর্থে সুখী-সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ — তা আজও গড়ে ওঠেনি। পরন্তু, যা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে একটি মজবুত শোষণমূলক অত্যাচারমূলক ‘সোস্যাল ইন্‌জাস্টিস’-এর (সামাজিক অবিচারের) উপর ভিত্তি করে এমন একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — যা জগদ্দল পাথরের মত আমাদের সমাজের বুকে, জনসাধারণের বুকের ওপর চেপে বসেছে। আর এই ব্যবস্থাটি এবং এই ঘটনাটিই হচ্ছে সমস্ত সামাজিক সমস্যা, যুবসমস্যা, সমাজপ্রগতির সমস্যার সামনে একটি প্রধান ঘটনা ও বাধাস্বরূপ। ফলে, কোন যুব আন্দোলনই বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনই কোন যুক্তিতেই রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আপনাদের সামনে যা কিছু সমস্যা তার মূল কারণই হচ্ছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। এ যদি আপনারা মেনে নেন, এবং যুক্তিবাদী হলে এ কথা অস্বীকার করার উপায়ও নেই, তাহলে কোন প্রগতিশীল যুব আন্দোলনই শোষিত জনসাধারণের মূল রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হতে পারে না, ‘অ্যাপলিটিক্যাল মুভমেন্ট’ হতে পারে না। কোন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনই এই মূল রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত আন্দোলন হতে পারে না, বা অ্যাপলিটিক্যাল মুভমেন্ট হতে পারে না। এই যখন অবস্থা তখন হয় শোষকশ্রেণী, না হয় শোষিতশ্রেণী — এর কোন একটির রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিজেদের যুক্ত হতেই হবে। আপনারা নিশ্চয়ই শোষকশ্রেণীর রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ — কোনভাবেই নিজেদের যুক্ত করতে চান না। কাজেই আপনাদের

যুব আন্দোলন এবং যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আপনারা পরিচালনা করছেন তার সামনে আজ মূল সমস্যা হচ্ছে, কী করে এই আন্দোলনগুলোকে দেশের শোষিতশ্রেণীর শোষণমুক্তির বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

একদল লোক যাঁরা বলেন, ছাত্র বা যুবসমাজ রাজনীতি বিমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র সমাজকল্যাণের কথা ভাববে — তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। তাঁদের মধ্যে কিছু 'জেনুইন্‌লি কনফিউজ্‌ড' (সত্যিকারের বিভ্রান্ত) লোক থাকতে পারেন — সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তাঁদের এই প্রচারের পেছনে যে শ্রেণীউদ্দেশ্য কাজ করছে তা হচ্ছে, যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে রাজনীতি বিমুখ করে তোলা। অথচ, গোটা দেশের সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি শোষিত শ্রেণীগুলির মূল রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক — কোন ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতি সম্বন্ধে খুব উন্নাসিক একটা বিরূপ মনোভাব থাকুক বা আর যাই হোক — এ বাস্তব ঘটনা। একমাত্র গায়ের জোর ব্যতিরেকে একে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন, এ সমাজে যে বৈষম্য — এ তো একটা বাস্তব ঘটনা। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত — এ একটা বাস্তব ঘটনা। আমরা বলছি বলে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত, বা আমাদের মতো কিছু লোক মনে করে বলে ভারতবর্ষের সমাজটা শ্রেণীবিভক্ত — এ নয়। ভারতবর্ষের সমাজ ঐতিহাসিক কারণেই শ্রেণীবিভক্ত। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক — এ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। এর একদিকে অত্যাচারিত, শোষিত, খেটেখাওয়া মানুষ — শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' (বুদ্ধিজীবী) সম্প্রদায় ; অপরদিকে বড় বড় পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসাদার, ধনী চাষী — এরা, এবং এই শোষকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক শক্তি। এই শ্রেণীবিভাগ আমরা করিনি। এটা না হলে হয়তো ভাল ছিল। মালিক মজুর যদি ইতিহাসে সৃষ্টি না হত, আমরা আপত্তি করতাম না। ধনীচাষী, ভাগচাষী, খেতমজুর যদি সৃষ্টি না হত, আমরা আপত্তি করতাম না। আমরা চেয়েছি বলে এ জিনিস হয়নি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে হয়েছে। ফলে, দোষটা এখন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ নেই। আমরা যেটা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, এই বাস্তব সত্যকে সাহসের সাথে স্বীকার করতে হবে। এই সত্যকে বুঝে এর চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। এর মানে কী? মানে এই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত — এই শোষক-শোষিতের মধ্যে যে

নিয়ত সংগ্রাম চলছে, যা আমাদের বানানো কথা নয় এবং যা আমাদের চেতনানিরপেক্ষভাবেই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে। আর, এই সংঘর্ষে আবর্তিত হয়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের 'ইন্টেলেক্চুয়াল ফ্যাকাল্টি', চিন্তাভাবনা, সামাজিক মনন — যা কিছু আমাদের মধ্যে আমরা দেখছি — তা এরই 'সুপারস্ট্রাকচার' (উপরিকাঠামো) — এই সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি এবং এই সংঘর্ষের দ্বারা আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে এই সংঘর্ষের সঠিক রূপ নির্ধারণ না করে আমরা এক পাও এগোতে পারি না। এগোবার চেষ্টা করলে তা হবে অন্ধের মতো চেষ্টা করা। আর, অন্ধ এগোতে গেলে যা হয়, এইরকমভাবে এগোতে গেলে ঠিক তাই হবে। আমাদের সবাইয়ের ক্ষেত্রে তাই হবে।

তাই, ভারতবর্ষের এই শোষক ও শোষিত দুই ভাগে বিভক্ত সমাজ, বিভক্ত জাতি — এই শ্রেণীবিভক্ত জাতির পটভূমিকায় সমস্ত আন্দোলনগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। এখানে একটা কথা আমি যুবকদের বলব যে, 'দেশপ্রেম', 'দেশাত্মবোধ', 'দেশের ডাক', 'দেশের স্বার্থ', 'দেশের ঐক্য' — এইসব কথাগুলোর সাহায্যে দেশের প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণী, বুর্জোয়ারা বেশিরভাগ সময়ই যুবকদের দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে বিপথে পরিচালিত করে থাকে। এখানে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, দেশকে ভালবাসা একটা মহৎ কাজ সন্দেহ নেই — কিন্তু দেশকে ভালবাসছি বলে মালিকের পদলেহন করা কোন মহৎ কর্ম নয়। দেশের স্বার্থের নামে মালিকশ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে চলা, আর নিজে ভাবতে থাকা যে আমরা দেশকে খুব ভালবাসি, আমরা দেশসেবক — এটা কোন মহৎ কর্ম নয়। এটা দেশের প্রতি চরম শত্রুতা, না জেনে হলেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং শেষ পর্যন্ত দেশের চরম অনিষ্টই এর দ্বারা সাধিত হয়। তাই আমি বলছি, 'আমাদের দেশ', 'আমাদের জাতি' — যার সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা একটা অবিভাজ্য জাতি নয়, তা শ্রেণীবিভক্ত জাতি — যার একদিকে মালিকশ্রেণী, অপরদিকে মজুরশ্রেণী। তাই এখানে 'জাতীয় ঐক্য', 'জনগণের ঐক্য', 'যুবকদের ঐক্য' — এই কথাগুলির দু'টি মাত্র সংজ্ঞা হতে পারে, দু'টি অর্থে এই কথাটা বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করা চলে, তা হ'ল — হয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থে যুবকদের, জনগণের, দেশের মানুষের ঐক্য — আর না হয় মজুরশ্রেণীর, শোষিতশ্রেণীর স্বার্থে দেশের যুবকদের, দেশের জনসাধারণের, শোষিত মানুষের ঐক্য। 'দেশের ঐক্য' — এই কথাটার

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মাত্র এই দু'টি সংজ্ঞা হতে পারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। আর বাকি সব ব্যাখ্যা দেশের নামে লোককে ধাপ্পা দেওয়ার বুর্জোয়া চালাকি মাত্র। তাই শ্রেণীচরিত্রের এবং শ্রেণীস্বার্থের উল্লেখ না করে শুধু 'দেশের সংহতি' ও 'দেশের স্বার্থ' কথাগুলো বললে চলবে না, 'দেশের জন্য লড়ছি' — এরকমভাবে বুঝলেও চলবে না, চলতে পারে না। 'প্রিসাইজ্‌লি' (যথার্থভাবে) আপনাদের বুঝতে হবে যে, 'দেশের স্বার্থ' বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের অর্থে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থের সাথে ঐতিহাসিকভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি শোষিতশ্রেণীর স্বার্থের সাথে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে, কৃষক-খেতমজুরদের স্বার্থের সাথে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থের প্রশ্নটি মিলিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এদেরই স্বার্থে দেশের আন্দোলন, যুবশক্তিকে পরিচালিত করা, যুবসমাজকে সুসংগঠিত করাই হবে দেশের কাজ করা। তাই 'দেশের স্বার্থ' কথাটার সাথে যুবকদের এই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, এই বিচার থাকা দরকার যে, তাঁরা ভারতবর্ষের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দেশের স্বার্থ বলতে যে স্বার্থের ঝান্ডা নিয়ে চলতে চাইছেন সেটা শোষকশ্রেণীর স্বার্থ, না শোষিতশ্রেণীর স্বার্থ। এই বিচারটি সমাধা না করে ভাসাভাসা ভাবে 'দেশ' 'দেশ' করলে আমরা বার বার মালিকশ্রেণীর চক্রান্তে পা দেব, তাদের হাতে শিকার হব, ইচ্ছা না থাকলেও হয়তো তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করে বসে থাকব। এমন ঘটনা আগেও বহুবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটবে।

আমি এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে বিস্তারিতভাবে যেতে চাইছি না। কিন্তু, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত জিনিসটা যুবসম্প্রদায়ের কাছে রাখতে চাইছি এইজন্য যে, শুধু পশ্চিমবাংলা বলে নয়, ভারতবর্ষ বলে নয়, গোটা পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনেই যুবসমাজ — শুধু মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুবকদের কথা নয় — শ্রমিক-চাষী যুবক, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত শক্তিই এই আন্দোলনের আসল প্রাণশক্তি। বুড়োরা, হিসেবীরা, সনাতনপন্থীরা কোনদিন সমাজে তুফান তুলতে পারেনি, সমাজের পরিবর্তন আনতে পারেনি, সামাজিক সমস্যা শেষপর্যন্ত সমাধান করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি, বা আন্দোলন পরিচালনা করেনি। যারা সমাজকে পাল্‌টেছে, যারা সভ্যতাকে গড়ার জন্য বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তারা সব দেশেই যুবসম্প্রদায়। আর, এই যুবসম্প্রদায় শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় নয়, শোষিতশ্রেণীর যুবসমাজ। কাজেই চাষীর ঘরের যুবকদের কথাও ভাবতে হবে, মজুর যুবকদের কথাও ভাবতে হবে, এবং তাদের ব্যাপকভাবে আন্দোলনের

মধ্যে টেনে আনার কথা মনে রেখেই তাদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে আপনারা যারা শিক্ষিত যুবক তাদের কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে যুব আন্দোলনে আজ এইটিই অত্যন্ত জরুরি কাজ। মনে রাখতে হবে, দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এই চাষী-মজুর যুবকেরা — তাদের বাদ দিয়ে শুধু শিক্ষিত যুবকেরা একটা চিন্তা, একটা ভাবনা, একটা আলোড়ন, একটা আদর্শবাদ শুধুমাত্র এনে দিতে পারেন — কিন্তু আন্দোলনের প্রচণ্ড তুফান এবং জোয়ার এদের বাদ দিয়ে আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন না। দেশব্যাপী বিরাট যুব আন্দোলন আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন না চাষী-মজুর যুবক-যুবতীদের বাদ দিয়ে। তাই চাষী-মজুর ঘরের যুবকদেরও ব্যাপকভাবে যুব আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনবার কথা আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

এখন, আপনাদের যুব আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামনে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল, কী করে সবরকম শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর যে মূল রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছে তার সাথে একে সংযোজিত করা যায়। এর জন্য দরকার সবরকম শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর ব্যাপক গণআন্দোলনগুলি গড়ে তোলা। সেই আন্দোলনের রূপ এবং গতিপ্রকৃতি কী হবে, তার সমস্যাগুলো কী ধরনের, তা বুঝে সঠিকভাবে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে যাঁরা এই আন্দোলন গড়ে তুলবেন তাঁদের দেশের যুবসম্প্রদায়ের বর্তমান মানসিকতাকে আগে ভাল করে বুঝতে হবে। বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মানসিকতার একটা দিক যেটা অত্যন্ত 'ভিভিড্‌লি', অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, এদেশে দিনের পর দিন যুবকরা 'সোস্যালি ইন্‌ডিফারেন্ট' (সমাজ সম্পর্কে উদাসীন) হয়ে পড়ছে। এটা প্রতিদিন যেন বাড়ছে। প্রতিদিন মানুষের মধ্যে, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা দেখছি সমাজ সম্বন্ধে, যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলন সম্বন্ধে একটা উন্নাসিক নিস্পৃহ মনোভাব, একটা 'কম্‌প্লিট ইন্‌ডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড' — এই যে জিনিসটা ক্রমেই 'গ্রো' (বৃদ্ধিলাভ) করছে — এর কারণ আপনাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে এ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতিভ্রষ্টতা ও আদর্শগত দেউলিয়াপনা — অর্থাৎ এক কথায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা ও চরম সুবিধাবাদই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী। তাই আজ আপনাদের একই সাথে দু-দিক থেকে এই অবস্থার

মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিদিন জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি গড়ে উঠছে, প্রত্যক্ষভাবে তার সাথে শরিক হয়েই যুব আন্দোলন গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করা এবং এইভাবে দেশজোড়া সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এইভাবে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মূল রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে পারলেই আপনারা দেশের বুকের ওপর আজ যে জগদ্দল পাথর চাপা রয়েছে তা ভাঙতে সক্ষম হবেন। কিন্তু, যাঁরা ভাঙবেন, দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই আন্দোলনের তুফান যাঁরা সৃষ্টি করবেন, তাঁদের প্রথমেই বুঝতে হবে সমাজ মানসিকতায় এই যে 'ইন্‌ডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড টু সোস্যাল প্রবলেম্‌স' (সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অনীহা) ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে — এর কারণ কী ? কেন সমাজের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, দিনের পর দিন সমাজ সম্পর্কে নিস্পৃহ মনোভাব গড়ে উঠছে ? অথচ, এই দেশেই তো আমরা দেখেছি, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতা আন্দোলনে — দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বান ডাকছে, জোয়ার বইছে, তখন তারা সমাজ চেতনায় টগবগ করেছে। চেতনার রূপ যাই থাকুক, উপলব্ধি যে স্তরেই থাকুক — কিন্তু একটা জিনিস সেদিনকার যুবকদের মধ্যে ছিল, তা হচ্ছে — আমি দেশের ছেলে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে, স্বাধীনতার সংগ্রামে আমার করণীয় আছে। পরাধীন এদেশের যুবক সেদিন যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 'কেরিয়ার' নষ্ট করে দিয়েছে — যারা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারত তারা পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসেছে হাসতে হাসতে, বিনা দ্বিধায়, এক মুহূর্তে — আত্মীয়স্বজন, বাপ-মা কারও অনুরোধ পরোয়া করেনি। এ তো ছিল। একে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশে, ভারতবর্ষের যুবকদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এ মনোভাব তো ছিল। কোথায় হারিয়ে গেল? কেন হারিয়ে গেল? এ প্রশ্নের জবাব আপনাদের খুঁজতে হবে।

আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, দেশের ছেলেমেয়েরা আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সমাজ সম্বন্ধে একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব বা নিস্পৃহ ভাব — একটা 'সেল্‌ফ্‌ সেন্টার্ড' (আত্মকেন্দ্রিক) মনোভাব যেন ক্রমাগত

দেশের যুবক-যুবতীদের আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ‘আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব, আমার এই এতসব ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার কোন দরকার নেই’ — এই মনোভাব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ধীরে ধীরে হলেও তাদের মধ্যে একটা জিনিস বাড়ছে — তা হচ্ছে, রাজনীতির প্রতি একটা অযৌক্তিক অনীহা। রাজনীতি করা একটা বাজে কাজ — এই তাদের ধারণা। বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্বার্থেই এইরকম চিন্তা অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে যে, রাজনীতি করা বড় কাজ নয়, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া বড় কাজ — বড় চাকুরে কিংবা ব্যবসাদার হয়ে পয়সা কামানো, আর মালিকের সেবা করার নাম হচ্ছে জীবনে মোক্ষ অর্জন করা। আমাকে বড় হতে হবে — মানে কী ? আমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে — অর্থাৎ আমাকে গোলাম হতে হবে। তার বিনিময়ে আমি পয়সা পাব, টেরিলিনের জামা পরব, আর ফুর্তি করতে পারব। রাজনীতি করে খালি জীবন বরবাদ হয়ে যাবে — ওসব বাজে লোকেরা করে, আর ভাল লোকেরা শিক্ষিত মিস্ত্রি হয়ে মালিকের দালালি করে। এই মনোভাব যুবকদের মধ্যে বাড়ছে, বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন, প্রশ্ন উঠতে পারে, যুবকদের মধ্যে এই হীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব গড়ে ওঠার, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অনীহার এই মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার এবং সমাজের অভ্যন্তরে যে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলো লড়াই করছে — সে সম্পর্কে এই চূড়ান্ত নিস্পৃহতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী? অনেকে মনে করতে পারেন যে, যুবকদের নৈতিক অধঃপতনই এর কারণ। কিন্তু, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এই কিছুদিন আগেও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও তো যুবকেরা অন্যভাবে আচরণ করেছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, যেদিন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে যুবসমাজকে বলা হত ‘দে আর দি ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল’, সেদিন কি স্বয়ং ব্রহ্মা বা ঈশ্বর নিজের হাতে খুব যত্ন করে ঐ সব ‘ফ্লাওয়ার’গুলো তৈরি করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন? আর আজ ব্রহ্মা বিরূপ, ঈশ্বর বিরূপ — তাই পশ্চিমবাংলার ছেলেগুলো সব উদ্ভট হয়ে গেছে? কাজেই, এর কারণ সমাজের অভ্যন্তরে, দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতে, দেশের নেতৃত্বের মানসিকতায় এবং নেতৃত্বের ‘স্ট্যান্ডার্ড’-এর (মানের) মধ্যে খুঁজতে হবে, তবেই তার যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে। আর, তা না হলে যে কথাটা দাঁড়িয়ে যায় তা হচ্ছে — ঐ ‘ব্রহ্মাই’ যা কিছু করছেন, আমাদের কিছুই করণীয় নেই। তাই, কেন ছেলেগুলো আজ এমন হয়ে যাচ্ছে — চোখের সামনে সকলেই দেখছেন, বাবা দেখছেন, অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন — ভাই দেখছে,

মাস্টারমশায় দেখছেন, সকলে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন — অথচ, সমাধান করার সত্যিকারের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এখানে অদ্ভুত শোনালেও একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার যে, আজকাল মাস্টারমশায়দেরও চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছাত্রদের সামনে এমন নজির স্থাপন করতে পারছে না যার দ্বারা ছাত্ররা কিছু শেখে। আপনাদের মধ্যে যদি মাস্টারমশায় কেউ থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। গ্রামের একটি সৎ, স্বাস্থ্যবান ছেলে — উগ্র আধুনিকতার হাওয়া যার গায়ে আজও লাগেনি, যে আজও বিলাসিতা শেখেনি, যে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আদর্শের কথা ভাবে — সে যদি এসে দেখে মাস্টারমশায় শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, নিজেই নীতিভ্রষ্ট এবং বিলাসিতায় মগ্ন, তাহলে সে কী শিখবে? অধঃপতন আজ স্তরে স্তরে। যারা শেখাবে তাদের কোন আদর্শবাদ নেই, তারা নিজেরাই দিগ্‌ভ্রান্ত। তারাও পয়সা রোজগার করার জন্য শিক্ষাকে একটা ব্যবসা করে ফেলেছে। অবশ্য শিক্ষকরা এ জন্য দায়ী — তাও নয়। তাহলেও এখানে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যদিও এসব সমাজের জন্যই ঘটছে তবুও ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রত্যেকেরই আছে। কেউ যদি মনে করেন, আমারও চোর হওয়ার 'জাস্টিফিকেশন' (ন্যায্যতা) আছে, কারণ আমি তো নিজের ইচ্ছায় চোর হইনি, সামাজিক পরিবেশের জন্যই আমি চোর তৈরি হয়েছি — এ রকম ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। সামাজিক পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারে যেভাবে সমস্ত মানুষের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণের জন্যই আমি সমাজের কথা বলেছি। কিন্তু, ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা করণীয় আছে। তার অধঃপতনের জন্য তার নিজেরও দায়িত্ব আছে, যেমন তার চরিত্র গঠনের জন্য তার নিজের একটা দায়িত্ব আছে। অর্থাৎ, তার নিজেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে যেটা আবার সামাজিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করে।

যুব আন্দোলন যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে যুবকদের মধ্যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা হটাতে হবে। তা না হলে যুব আন্দোলনে জোয়ার আসতে পারে না। আগেই বলেছি, এ শুধু নিছক আলোচনা, তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারেই আসবে না। আন্দোলনকে এর সঙ্গে মেলাতে হবে, সমস্তপ্রকার অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে তার বুনিয়াদ। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট আদর্শ যদি তার সামনে না থাকে, দেশের সমস্ত পরিস্থিতির একটা সঠিক বিশ্লেষণ যদি তার পিছনে না থাকে, 'অ্যানালিসিস' যদি তার পিছনে না থাকে, প্রতিটি সমস্যার কারণ যদি সে সঠিকভাবে ধরতে না পারে

— তবে সে আন্দোলন হবে ভুল পথে, সে আন্দোলন জয়যুক্ত হবে না। এ সমস্যার একটি দিক আমি আপনাদের সামনে বলব, আপনারা ভেবে দেখবেন। সমাজে মানুষ যে উদ্বুদ্ধ হয়, ক্রিয়া করে, এই যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবকরা এগিয়ে এসেছিল — কেন? গোটা সমাজের পুরনো যে মানসিকতা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তা গোষ্ঠীবদ্ধ, পরিবারকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন, স্থানীয় মানসিকতা ছিল। পুরনো সেই মনোভাবের সাথে আজ 'দেশ' বলতে যে ব্যাপক মনোভাবকে বোঝায় তার কোনও মিল নেই। দেশে যখন রেনেসাঁসের জাগরণ শুরু হ'ল — রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল পর্যন্ত এই যে ধারাবাহিকতা — এতে দেশের যুবকদের সামনে একটা নতুন নৈতিকতা, একটা নতুন আদর্শবাদ, 'দেশ' সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা ও চেতনা, সমাজ সম্বন্ধে একটা নতুন চেতনা — এককথায় একটা নতুন আদর্শ, নৈতিকতার ধারণা সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল। পুরনো প্রচলিত আদর্শ ও নৈতিকতা, নীতিবোধের ধ্যানধারণাকে লড়াই করে পরাস্ত করে দিয়ে যুব মনে যে নতুন আদর্শ ও নীতিবোধ প্রভাব বিস্তার করতে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হ'ল — তা ভারতবর্ষে একটি নতুন জাগ্রত মানবতাবোধের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিকতা বা স্বাধীনতা বা দেশাত্মবোধের চেতনা। তাহলে, আদর্শই সেদিন এই চেতনা, এই নৈতিকতা, এই মূল্যবোধ সমাজের মধ্যে এনেছিল। পুরনো আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তা যখন সমাজের মানসিকতাকে অধিকার করতে, তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তখনই তার আবর্তে আবর্তিত হয়ে দেশের যুবসম্প্রদায় পাগলের মতো ছুটেছে নতুনের সন্ধানে। মানুষের দৃষ্টিকোণ পাল্‌টে গেছে, কূপমণ্ডুকতা কেটে গেছে, মানুষ স্বাধীনতার কথা ভাবতে শিখেছে, জাতির 'কন্‌সেপ্‌শন' (ধারণা) পাল্‌টে গেছে, দেশ সম্বন্ধে 'লোকালাইজড' (অঞ্চলভিত্তিক) ধারণা পাল্‌টে গেছে, পরিবার সম্বন্ধে কূপমণ্ডুক ধারণা পাল্‌টে গেছে। এগুলো পাল্‌টে গিয়ে মানুষ সামাজিক হয়েছে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু, আপনাদের মনে রাখতে হবে, সেই আদর্শবাদ ছিল মূলত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং তারই ভিত্তিতে তার গণতান্ত্রিক চেতনা — বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণীচেতনা। এই বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতন্ত্রের চেতনা এবং স্বাধীনতার ধ্যানধারণা, দেশাত্মবোধের ধ্যানধারণার উপরই মূলত সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্যানধারণা হলেও সেদিন তা ছিল বিপ্লবাত্মক, তা

ছিল প্রগতিশীল। তাই সেদিন সেই আদর্শবাদের ঝান্ডা নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়তে গিয়েছেন, 'দেশের স্বাধীনতায় আমার জন্মগত অধিকার' — এই কথাটুকু যাঁরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হোক্, কাব্যের মধ্য দিয়ে হোক্, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হোক্, যেভাবেই হোক্ বলেছেন — তার জন্য তাঁদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, তার জন্য তাঁদের কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অপরিসীম। সে পথ ছিল দুঃখের পথ, কষ্টের পথ, সংগ্রামের পথ। সে কষ্টের মধ্যে, সে সংগ্রামের মধ্যেই ছিল আনন্দের রূপ। তা নির্জীব, নির্বীর্য, জড় পদার্থের ও ক্লীবের আনন্দ ছিল না।

কিন্তু, স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তার ফলে সমাজের মৌলিক সমস্যা, অর্থাৎ গণমুক্তি আন্দোলন সফল হতে পারল না, গণমুক্তির মূল প্রশ্নটির সমাধান হতে পারল না। এমনকী রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ 'ন্যাশনালিটি'গুলোকে (খণ্ড-জাতিগুলোকে) নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ হলেও বিভিন্ন অংশের জনগণের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থেই, বুর্জোয়া জাতীয়তার অর্থেই যে ঐক্যবদ্ধতা, তা পর্যন্ত এদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। দেশের জনসাধারণ 'রেস'কে (জাতিকে) ভিত্তি করে, ধর্মকে ভিত্তি করে, 'কাস্ট্'কে (বর্ণকে) ভিত্তি করে বিভক্ত হয়ে রইল। রাজনৈতিকভাবে আমরা ভারতবাসী হয়তো এক, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমরা বাঙালি, বিহারি। এই বাঙালি-বিহারিটা, অর্থাৎ খণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাভোগীদের চক্রান্তে জনসাধারণের মধ্যে এমন বড় হয়ে অনেক সময় দেখা দেয় যে, গোটা ভারতবর্ষ ছিঁড়ে ফেলতেও আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয় না। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী জনসাধারণ শুধু যে খণ্ড জাতীয়তার মনোভাবকে ভিত্তি করে পরস্পর বিভক্ত তাই নয়, পরমুহূর্তেই তারা আবার হিন্দু এবং মুসলমান। বাঙালি-বিহারি, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তো আছেই, আবার হিন্দুসমাজের মধ্যে যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, সেখানেও ব্রাহ্মণ, শূদ্র, 'লোয়ার কাস্ট্' (নিচু বর্ণ) — এইভাবে বিভক্ত। হয়তো এই কলকাতা শহরের বুকে এসব অনেক কমে গেছে কিন্তু একেবারেই নেই — একথা বলতে পারবেন না। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ — এগুলো মানুষ আজ কিছু কিছু করে সত্য, কিন্তু সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে এসব আজও সম্মানের আসন পায়নি। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে তার একটা সম্মানের স্থান হয়তো আছে,

কিন্তু গোটা সমাজটা সেই অন্ধকূপেই আজও পড়ে আছে। শিল্পবিপ্লবের দিক দিয়ে খানিকটা আমরা এগিয়েছি, দেশের সম্পদের অর্থে আমরা খানিকটা এগিয়েছি। অর্থনীতি এবং রাজনীতির দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে আমাদের সমাজ মূলত পুঁজিবাদী সমাজ। অথচ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দিকটা যদি লক্ষ্য করি, সমাজের আচার বিচারের দিকে যদি তাকাই, জনগণের জীবনযাত্রার সামাজিক দিকটা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব, আজও সেই অন্ধযুগের মতোই দেশের জনগণ ধর্মকে ভিত্তি করে, কাস্ট্‌কে ভিত্তি করে, রেসকে ভিত্তি করে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

এর কারণ এদেশের মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভূরা। যেহেতু ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্বপুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগোষ্ঠীরই অংশীদার, সেহেতু এ যুগে তার মধ্যে আগের সেই পুরনো বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর ছিল না। স্বাধীনতা তাদের দরকার ছিল, কিন্তু বিপ্লব তাদের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতা বলতে তাদের প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশের হাত থেকে শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রটা কেড়ে নেওয়া। বিপ্লবের আঘাতে গোটা সমাজটাকে পাল্‌টে সমাজের আধুনিকীকরণ করা — এ তাদের প্রয়োজন ছিল না। তাই একদিকে তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে, আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের প্রতি আপসমুখী মনোভাবের দরুনই তারা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বার রুদ্ধ করেছে। তাই ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি, হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। আর একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন, এমনকী ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব থেকেও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে পারেনি। আর, এই 'রিলিজিয়ান ওরিয়েন্টেড ন্যাশনালিজম' (ধর্মীয় প্রভাবমিশ্রিত জাতীয়তাবাদ) ভারতবর্ষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব রুখে দিয়েছে। তাই এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে তাকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার কথা ছিল, গোটা দেশকে গণতন্ত্রীকরণ করার কথা ছিল, বুর্জোয়া অর্থেই বা পুঁজিবাদী বিপ্লবের অর্থেই এটা করার কথা ছিল — ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী বিপ্লবভীতির জন্য, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসমুখী মনোভাবের জন্য তা করেনি। এ কাজ

সম্পন্ন হতে পারত যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে থাকত, শ্রমিকশ্রেণীর দলের হাতে থাকত। কিন্তু, তদানীন্তন সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর দল বলে যাঁরা নিজেদের প্রচার করেছেন, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি বলে এদেশে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নেতৃত্ব দখল করার কোন চেষ্টাই ভালভাবে করেননি। উপরন্তু, তাঁদের অজস্র ভুল নীতি অনুসরণ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের চাটুকারী রাজনীতির চর্চা এদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করতে সাহায্য করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কার্যক্রমকে বুর্জোয়ারা ফেলে দিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে — বামপন্থী বলে, সমাজবাদী বলে, সাম্যবাদী বলে পরিচয় দিয়েও তাঁরা সেদিন সে কার্যক্রম তুলে ধরতে পারেননি। যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে গেলেন রামমোহন থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র-নজরুলেরা — সে ঝান্ডা রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা, এমনকী সাম্যবাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন এমন নেতারাও অবহেলায় পায়ে মাড়িয়ে চলে গেলেন। ফল যা হবার তাই হ'ল। আন্দোলন হ'ল, কোরবানি হ'ল, জান দেওয়া হ'ল, এত সব কিছুর বিনিময়ে যেভাবেই হোক স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত এল, কিন্তু তার সমস্ত ফল চলে গেল পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে। দেশ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হ'ল, কিন্তু দেশের জনগণ বিভক্ত হয়ে রইল জাতিগত বৈষম্য, কুসংস্কার এবং জাতপাতকে ভিত্তি করে। শুধু কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণী অর্থেই আমাদের জাতি দুটো ভাগে বিভক্ত? শোষিতশ্রেণী আবার ধর্মকে ভিত্তি করে, জাতপাতকে ভিত্তি করে, বর্ণকে ভিত্তি করে আলাদা। আর, শোষিত জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের বিভক্তি, শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে মালিকদের হাতে জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের বিভেদকে জিইয়ে রেখে ও সময়মত তাকে কাজে লাগিয়ে মালিকদের অবাধে লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার একটা বাড়তি সুযোগ। তাই আজ ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুবসমাজের ওপর একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধানের গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। তা হ'ল, মূল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করার সাথে সাথে এই অপূরিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে ধর্মান্ধতা, প্রাদেশিকতা ও জাতপাত প্রভৃতি বিষাক্ত ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে শোষিত জনসাধারণের মধ্যে লৌহদৃঢ় ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলা। কিন্তু, সফলতার সাথে এ কাজ করতে হলে তার আগে সর্বপ্রথম আদর্শের প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া

দরকার।

বুর্জোয়া স্বাধীনতা বা জাতীয়তাবোধের যে আদর্শকে উচ্চারণ করলে একদিন মানুষকে জান দিতে হতো, আজ সেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধ্যানধারণা, দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেমের ধ্যানধারণা শোষকশ্রেণীর হাতে সুবিধার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই আদর্শবাদ আজ শোষকশ্রেণীর শাসন, জুলুম, আধিপত্য রক্ষার আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে অবাক হবার কোন কারণ নেই। ইতিহাসে কোন আদর্শবাদই শাশ্বত, চিরস্থায়ী নয়। 'আদর্শের জন্য মানুষ' — এ কথাটা যদি এইভাবে বোঝেন যে, সমস্ত আন্দোলনের সামনেই একটা আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শের দ্বারা সমাজকে পরিবর্তিত করতে হয় — এভাবে বুঝলে হয়তো কথাটা খানিকটা সত্য। কিন্তু, 'আদর্শের জন্য মানুষ' — কথাটা এভাবে বলার মধ্যে যে ধারণাটা প্রকাশ পাচ্ছে তা 'এসেন্‌সিয়ালি' (মূলত) ভুল। 'আদর্শের জন্য মানুষ' নয় — সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, প্রগতির জন্য আদর্শ। আদর্শের জন্ম হচ্ছে একদিকে মানুষের মননশীলতার সাথে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে ব্যক্তিসত্তার সাথে তার সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, এবং এই অর্থে আদর্শের স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। হঠাৎ একটা আদর্শ কোথাও থেকে এসেছে, আর তারপর মানুষের মস্তিষ্ক সেটাকে নিয়ে চলেছে — এইভাবে আদর্শের জন্ম হয়নি। সমাজের অভ্যন্তরে প্রগতির জন্য, বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে মননশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে ভাবজগতের জন্ম। এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বাঁচার তাগিদে উৎপাদনের প্রয়োজনেই মানুষের মধ্যে প্রথম সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটে এবং মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। তাই মানুষের জীবনও যেমন পাল্‌টাচ্ছে, প্রকৃতি যেমন পাল্‌টাচ্ছে, সমাজ পাল্‌টাচ্ছে — তেমনি মানুষ এবং প্রকৃতির সংঘর্ষের রূপও পাল্‌টাচ্ছে, তার চরিত্র পাল্‌টাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আবার সমাজের সমস্যাগুলির রূপও পাল্‌টাচ্ছে। ফলে, আদর্শ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। আদর্শও পাল্‌টাতে বাধ্য। তাই সমস্ত আদর্শ বা আদর্শবাদেরই জন্ম-মৃত্যুর একটা ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস আছে। শাশ্বত আদর্শ, শাশ্বত নীতি, অপরিবর্তনীয় শাশ্বত মূল্যবোধ — এসব মিষ্টি কথা, কিন্তু মিষ্টি বাজে কথা, কাজের কথা নয়। বড় মানুষের মুখ দিয়ে বেরোয় বলেই কোন আদর্শ শাশ্বত সত্য হয়ে যায় না। কারণ, বড় মানুষের চিন্তাও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ব্রহ্মার বরপুত্র নন! তিনি সামাজিক জীব। সমাজের

আভ্যন্তরীণ আলোড়নে, সমস্ত সংঘর্ষের আলোড়নে, মানুষ ও প্রকৃতির সংঘর্ষের আলোড়নেই তাঁর চিন্তা আবর্তিত। এই দুই সংঘর্ষের আবর্তে যে কোনও বড় মানুষ আবর্তিত। তার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা কারুর নেই। তাই মার্কস বলেছেন যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক 'প্রোডাক্শন-রিলেশন' (উৎপাদন সম্পর্ক)। অনেকে মার্কসের এই উক্তিকে সংকীর্ণ অর্থকরী সম্পর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তা ভুল। 'প্রোডাক্শন' (উৎপাদন) বলতে তিনি 'স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্শন' (ভাবগত উৎপাদন) এবং 'মেটিরিয়াল প্রোডাক্শন' (বস্তুগত উৎপাদন) — দুটোই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মূল্যবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন, 'জুরিসপ্রুডেন্স' (বিচারশাস্ত্র) — এগুলো হচ্ছে 'স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন অব হিউম্যান বিয়িং' (মানুষের ভাবগত উৎপাদন)। আর, মেটিরিয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন হয় এবং আমরা যা ভোগ করি। সাথে সাথে মার্কস বলেছেন, এই বস্তুগত উৎপাদনকে যে শ্রেণী 'কন্ট্রোল' (নিয়ন্ত্রণ) করে, ভাবগত উৎপাদনকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সমাজের বস্তুগত উৎপাদনটা যে শ্রেণীর হাতে, যার নিয়ন্ত্রণে, যার আধিপত্যে — সমাজে ভাবগত উৎপাদন, অর্থাৎ সমাজের গোটা মানসিকতাকেও তারাই মূলত প্রভাবিত করে। এখানে মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে বিরুদ্ধ শক্তিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা সে যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা — যা কোন একটা 'গিভেন' (বিশেষ) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রচলিত, তা যতদিন ধরেই প্রচলিত থাক না কেন, যেভাবেই মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করুক না কেন — তার সঠিকতা — তার চরিত্র প্রগতিশীল, না প্রতিক্রিয়াশীল — তা আমাদের উপকার করবে, না সমাজপ্রগতিতে আজ বাধা সৃষ্টি করবে — এ বিচার সবসময়ই করতে হয়। আর, এ বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় যে, এই মূল্যবোধ কোন্ বিশেষ ধরনের 'প্রোডাক্শন সিস্টেম' (উৎপাদন ব্যবস্থার) অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'সুপারস্ট্রাক্চার' (উপরিকাঠামো)। সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত হয়নি, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা যখন ব্যক্তিগত বা শ্রেণীর অধিকারে যায়নি, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনেই যখন উৎপাদন হত, তখন সমাজচিন্তাও শ্রেণীবিভক্ত হয়নি। কিন্তু, যখন থেকে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে তখন থেকে সমাজচিন্তাও শ্রেণীরূপ ধারণ করেছে। একদিকে মালিকশ্রেণী বা শোষকশ্রেণীর চিন্তা, অপরদিকে শোষিতশ্রেণীর চিন্তা। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, অপরদিকে প্রগতিশীল চিন্তা — এ'দুটোই আছে। একটি বিশেষ সমাজের মধ্যে যেভাবে সমাজচিন্তা একটি

ব্যক্তির মধ্য দিয়ে 'পার্‌সনিফিকেশন' (ব্যক্তিকরণ) ঘটে — তাই হ'ল ব্যক্তিচিন্তা। তাই, কী করে ব্যক্তি শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, সমাজের ঊর্ধ্বে উঠবেন? রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা বিবেকানন্দের চিন্তা হচ্ছে সমাজচিন্তার একটি বিশেষ ধরনের ব্যক্তিকরণ। এই চিন্তা আবার সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করছে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিচিন্তার পারস্পরিক সম্বন্ধ 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল' (দ্বন্দ্বমূলক) অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ — একে অপরকে প্রভাবিত করে। এখানে মূল যে কথাটা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, সমাজচিন্তাই ব্যক্তিচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তিকৃত হয়, ব্যক্তিকরণ হয় — এরই নাম ব্যক্তিচিন্তা। 'পারসনিফিকেশন অব সোস্যাল থিঙ্কিং ইজ ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং'। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামাজিক চিন্তা যেখানে শ্রেণীচিন্তা সেখানে কোন ব্যক্তিই শ্রেণীস্বার্থ থেকে মুক্ত ব্যক্তি নয়। যিনি যত বড় মহামানবই হোন, তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারুন আর না পারুন — কোন না কোন শ্রেণীস্বার্থের সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়, কোন না কোন শ্রেণীর চিন্তাকেই তাকে প্রতিফলিত করতে হয়। ফলে, এরূপ অবস্থায় জেনে হোক বা না জেনে হোক, যখন কোন না কোন শ্রেণীর চিন্তার সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে তখন বাস্তবে কোন না কোন শ্রেণীস্বার্থ নিয়েই চলব, অথচ নিজে ভাবতে থাকব — 'আমি কোন শ্রেণীর সাথেই যুক্ত নই, আমি গোটা সমাজের স্বার্থ নিয়েই ভাবছি' — এর চেয়ে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রতারণা আর কিছু হতে পারে না।

অতীতে বহু মহামানবের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছে। তাঁরা যখন গোটা মানবজাতির কথা বলেছেন তখনও তাঁরা জানেন না যে, আসলে তাঁরা একটা শ্রেণীচিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছেন। এটা তাঁরা না জানতে পারেন এবং না জানলে তার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত সততার প্রশ্ন হয়তো উঠবে না, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তা শ্রেণীচিন্তা নয় বা শ্রেণীচিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত — একথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে মেনে নেওয়া অসম্ভব। যদি না আমরা মেনে নিই যে, চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, চিন্তা হচ্ছে এমন একটা 'ফ্যাকাল্টি' (মানসিক শক্তি) যেটা 'রেডিও অ্যাক্‌টিভ' শক্তির মতোই মানুষের মস্তিষ্কে এসে ঢোকে, বা ঢোকে একটা ব্রহ্মসূত্র বা পরম ব্রহ্ম 'অ্যাব্‌সলিউট' (অসীম) কোন 'এন্‌টিটি' (সত্তা) থেকে। কিন্তু, চিন্তা যদি মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়া হয় — এ যদি বায়োকেমিক্যাল অ্যাকশন, ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন অব দ্য ব্রেন' (মস্তিষ্কের 'বায়োকেমিক্যাল' ক্রিয়া ও 'ফিজিওলজিক্যাল' প্রক্রিয়ার ফল) হয় — তাহলে

একথা মানতেই হবে যে, সমস্ত ব্যক্তিচিন্তাই 'পার্সনিফিকেশন অব সোস্যাল থিঙ্কিং' (সমাজচিন্তার প্রতিফলন)। আর, সমাজ যেখানে শ্রেণীবিভক্ত সেখানে সমস্ত চিন্তাই শ্রেণীচিন্তা। ব্যক্তিচিন্তাও সেখানে শ্রেণীচিন্তারই প্রতিফলন মাত্র।

এখন, এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে চান তাঁদের কাছে কোন্ শ্রেণীর চিন্তা প্রগতিশীল, আর কোন্ শ্রেণীর চিন্তা একটা বিশেষ সমাজে একটা বিশেষ পরিবেশে প্রতিক্রিয়াশীল — এটাই মূল বিচার্য বিষয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তা এবং তার ভিত্তিতে যে আদর্শবাদ, দেশাত্মবোধের ধারণা, দেশের ঐক্যের ধারণা, স্বাধীনতার ধারণা, মানবতার ধারণা, ন্যায়নীতি-মূল্যবোধ-রুচির ধারণাগুলো — তা বুর্জোয়াশ্রেণীর হলেও তদানীন্তন সমাজে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভাঙবার লড়াইয়ের সময় আপেক্ষিক অর্থে তুলনামূলক বিচারে তদানীন্তন সমাজের পুরনো ভাবনাধারণাগুলির থেকে প্রগতিশীল ছিল। কার্যত সীমিত ক্ষেত্রে হলেও তার একটা বিপ্লবাত্মক রূপ ছিল। তাই সেই আদর্শের যখন জয়ডঙ্কা বেজেছে, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার উপর যখন তার প্রাধান্য বিস্তার হয়েছে, গোটা দেশের মানসিকতা তখন প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগ করে উঠেছে, তা ব্যক্তিমানসিকতাকে সমাজচেতনায় প্রভাবিত করেছে। বুর্জোয়া ভাবধারার সেই বিপ্লবাত্মক যুগে যুবকদের সামাজিক অনীহা ছিল না, সামাজিক চেতনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, আজ আমরা একটা অন্য সমাজব্যবস্থায় আছি। আজ বুর্জোয়ারা, বিশেষ করে জাতীয় বুর্জোয়ারাই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের মারফত তাদের শাসন জগদ্দল পাথরের মতো এদেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণ, অত্যাচার আর লুঠের রাজত্ব কায়েম করে সমাজপ্রগতির সামনে আজ তারাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিশ্রমের ফলে যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে — তার চরিত্র সামাজিক। ভারতবর্ষের মানুষ আজ তার নিজের প্রয়োজনে যে পরিশ্রম করছে তারও চরিত্র হয়ে পড়েছে সামাজিক। সে যে উৎপাদন করে তারই মধ্যে তার শ্রম মিশে আছে। কারখানায় সে যে উৎপাদন করে তা নিজে খাবার জন্য করে না; তার বিনিময়ে তাকে 'ওয়েজ' দেওয়া হয়, মাইনে দেওয়া হয়। এমন ধরনের শ্রমকে আমরা বলি সামাজিক শ্রম, অর্থাৎ যার চরিত্র সামাজিক। বুর্জোয়ারা যখন বলে দেশের মানুষকে পরিশ্রম করতে হবে, তখন তারাও বলে দেশের সম্পদ গড়তে হবে। তারা একথা বলে না যে, দেশের মানুষকে পরিশ্রম করতে হবে কারণ

তাদের পেট পুরাতে হবে। তাহলে, সাধারণ মানুষের পরিশ্রম দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করছে, সমাজের মঙ্গল করছে। ওদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, মজুরের শ্রমের চরিত্র হচ্ছে সামাজিক। যে উৎপাদন তারা করছে তারও চরিত্র সামাজিক। কিন্তু, উৎপাদনের মালিকানা ব্যক্তিগত। ফলে, সমাজের মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট যে সামাজিক সম্পদ তা ব্যক্তিগত মালিক 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট' (আত্মসাৎ) করছে, লুটে নিচ্ছে সমাজকে শোষণ করে।

মজুরকে ঠকিয়ে এই যে মালিকশ্রেণী সামাজিক সম্পদ আত্মসাৎ করছে, তার ফলে ক্রমাগত মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়ে জাতীয় বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। এইভাবে ক্রমাগত বাজার সঙ্কোচনের ফলে শিল্প-কারখানা সম্প্রসারণের মারফত পুঁজিপতিরা আজ আর অধিক লোকের কর্মসংস্থান করতে পারছে না। কারণ, যে শিল্প-কারখানাগুলি টিকে আছে তারই অস্তিত্ব আজ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, ক্রমেই বেকার সমস্যা বাড়ছে। এরূপ অবস্থায় শহরাঞ্চলেই যেখানে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা বরং ক্রমাগত লোক চাকরি হারিয়ে বেকার হচ্ছে, সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আমূল ভূমিসংস্কার ও কৃষির সর্বাত্মক আধুনিকীকরণ আজ আর কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ, যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের মারফত কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে গেলে এক ধাক্কায় যে লক্ষ লক্ষ বাড়তি গ্রামীণ বেকার সৃষ্টি হবে, তাদের কর্মসংস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে করা অসম্ভব। তাই পুঁজিবাদের রক্ষক বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সরকার এ কাজে হাত দিতে পারে না। এরকম বহু জিনিস রয়েছে যার আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সে সব জিনিস বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কিন্তু, যে মূল কথাটা আমি আপনাদের বোঝাতে চাইছি তা হচ্ছে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব বা অসামঞ্জস্যই হচ্ছে সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের মূল কারণ।

অপ্রতিহত গতিতে সমাজে শিল্পবিপ্লব এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানের ক্রমবিকাশের দ্বার খুলে দিতে হলে সর্বাত্মকভাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু, এখানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা হবে কী করে ? এখানে বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে পুঁজিপতিরা। তারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে 'টেক্‌নোলজিক্যাল' অর্থে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে উৎপাদনের ব্যয় কমাবার কাজে, আর তার শাসনযন্ত্রকে 'মডার্নাইজ' (আধুনিকীকরণ) করার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই। উৎপাদনের যদি বাজার না থাকে, উৎপাদনের উপায়গুলোকে

যদি আজ আর ক্রমাগত 'ইম্‌প্রুভ' (উন্নত করার) এবং 'মেকানাইজ' করার 'আর্জ' (চাহিদা) না থাকে, যদি বাজার মন্দা হয় তাহলে তারা বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করে দেবে এবং রুদ্ধ করে দিচ্ছেও। তাই আমরা যখন বলি যে, ভারতবর্ষে আজ আবার একটা বিপ্লব দরকার, ভারতবর্ষের মুক্তির দরজা খুলে দিতে হলে বিপ্লবের দরকার, সমাজপ্রগতির দ্বার খুলে দিতে হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দরকার, তখন আমরা বলি পুঁজিবাদী লোভ, মুনাফাচক্র এবং 'মোটিভ' (উদ্দেশ্য) থেকে উৎপাদনকে, বিজ্ঞানকে, 'আর্ট'কে, সাহিত্যকে, মূল্যবোধকে, আচার-বিচারকে — এককথায় গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং বিজ্ঞানসাধনাকে মুক্ত করার কথা। শুধু মজুরের আর্থিক শোষণ থেকে মুক্তির লড়াই সমাজতন্ত্রের লড়াই নয়, শুধু বেকারদের কাজ পাওয়ার লড়াই সমাজমুক্তির লড়াই, সমাজতন্ত্রের লড়াই নয় — পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, গোটা উৎপাদনকে, জ্ঞানবিজ্ঞানকে মুক্ত করার লড়াই। আমাদের মূল্যবোধ, রুচি এবং আর্ট, শিল্প-সাহিত্য সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী জুলুম এবং 'মোটিভ', যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার থেকে মুক্তির লড়াই। এমনকী ভালবাসা, পারিবারিক শান্তির ক্ষেত্রেও মুক্তির লড়াই। চোখ থাকলেই দেখতে পাবেন, আজকাল যেসব নরনারী যৌবনে ভালবাসার পেছনে ছুটছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শেষপর্যন্ত সত্যিকারের ভালবাসা পান না। আজকে এ অনেকটা আলেয়ার পেছনে ছোটার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাউকে বিশ্বাস নেই, ভালবাসাতেও যেন বিশ্বাস নেই। কোন পরিবারকেই সুখী পরিবার বলবার উপায় নেই। এ সমস্ত কিছুর কারণ আসলে সামাজিক মন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে যাচ্ছে তা বুঝতে হবে। জীবন সম্বন্ধে একটা হতাশার ভাব আসছে — কোনমতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া। অপরদিকে একটা 'ডেস্‌পারেট্‌নেস' (উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব) বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ, এই যে ডেসপারেট্‌নেস আমরা লক্ষ্য করছি, এটা কিন্তু জীবনকে পরিবর্তিত করা, উন্নত করা, উন্নত আদর্শ অনুযায়ী নতুনভাবে 'রিমোল্ড' (গঠন) করার জন্য নয়; এ যেন যেকোনভাবেই হোক নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলা। এ ডেসপারেট্‌নেস, অর্থাৎ বেপরোয়াভাব হচ্ছে 'এইমলেস' (উদ্দেশ্যহীন) — যা হয় একটা কিছু করে যাও, তাতে যা হয় হোক, এতসব কথা ভাববার অবসর নেই। ভাববার এবং গভীরভাবে চিন্তা করবার মনোবৃত্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এ একটা মারাত্মক হুজুগ। এই যুক্তিহীন বিচারহীন হুজুগে মনোভাব আজ সমস্ত সমাজমানসিকতাকে ছেয়ে ফেলছে।

ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেস এরূপ মানসিকতাকে বাড়াতে সাহায্য করবে — এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু, যখন দেখি শক্তিশালী বিরোধী দলগুলির বেশিরভাগই আজ নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য মিথ্যা বলা, গল্প বানানো থেকে শুরু করে যুক্তিহীন, বিচারহীন, স্লোগানসর্বস্ব হুজুগে মনোভাব বাড়াতে সাহায্য করছে এবং জনসাধারণের গণআন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে শেষপর্যন্ত এসবের মারাত্মক ফল কী তা পর্যন্ত বিন্দুমাত্র বোঝবার চেষ্টা করছে না — তখন সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাই। কাজেই, আজ যখন দেশের ছেলেমেয়েরা হুজুগের শিকার হচ্ছে তখন এজন্য শুধু তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যুব আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের এই মূল সমস্যাটাকে সঠিকভাবে ধরতে হবে এবং এই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী যুবসম্প্রদায়কে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত বিপ্লবী আদর্শবাদ ও যুব আন্দোলনের কার্যক্রম নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

ভারতবর্ষ আজ আদর্শচ্যুত। ভারতবর্ষের জনজীবনের সামনে আজ যে নতুন বিপ্লবী আদর্শ জনতাকে সঠিকভাবে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেল করে তুলতে পারে সেই আদর্শ নানা অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির দরুন জনসাধারণের সামনে আজও পুরোপুরি আসতে পারছে না — অর্থাৎ জনমনে আজও তা যথেষ্ট জায়গা করে নিতে পারেনি। এদেশে এই বিপ্লবাত্মক আদর্শের জন্ম হয়নি — এমন নয়। কিন্তু, তার প্রভাব সে আজও জনগণের উপর বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। পুরনো ভাবাদর্শ 'প্রিভিলেজ'-এ পর্যবসিত হয়েছে। যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ একদিন মানুষকে মরতে শিখিয়েছে, লড়তে শিখিয়েছে, সমাজকে নতুন করে রিমোল্ড করতে শিখিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করতে শিখিয়েছে — সে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বা মানবতাবাদ আজ শুধু মানুষকে বোঁচকার সন্ধানই দিয়ে থাকে। আজ জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাস্তবে এর মানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, চাকরি কর আর গোলামি কর। দেশকে ভালবাসার বুর্জোয়া অর্থ হচ্ছে — নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করবে, রাজনীতি করবে না। আর যদি করও তাহলে পুঁজিপতিশ্রেণীর ও বুর্জোয়াদের মনোমত রাজনীতি করবে। বুর্জোয়ারা প্রচার করে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার নিজের এবং নিজ পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে নজর দেয় তাহলেই নাকি সত্যিকারের মঙ্গল সাধিত হবে। কারণ, ব্যক্তি আর পরিবারগুলোকে নিয়েই দেশ। অবশ্য যখন তাদের যুদ্ধবিগ্রহের দরকার হয় তখন তারা ধূয়া তোলে, দেশের জন্য সর্বস্ব দেওয়াই মহান কর্তব্য। যখন বুর্জোয়াদের নিজ শ্রেণীস্বার্থে যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন নেই তখন বুর্জোয়াদের এই তত্ত্বের মানে দাঁড়াচ্ছে এককথায়, তোমার কাজ

হচ্ছে নিজের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করা। হয় 'টেক্‌নিসিয়ান', নয় 'ইঞ্জিনিয়ার' হও — হয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর গোলামি কর। আর, যত ভাল করে গোলামি করবে তত তুমি পুঁজিপতিদের 'প্রোডাকশন সিস্টেম'-কে (উৎপাদন ব্যবস্থাকে) নিশ্চিন্ত করছ, অর্থাৎ তুমি তত মালিকের শান্তি নিশ্চিন্ত রাখছ — ততই তুমি বড় দেশসেবক। আর যারা এর বিরুদ্ধে চিৎকার করে তারাই ওদের মতে দেশের শত্রু। এখন এই 'দেশ' কথাটা নিয়েই হচ্ছে আসল গোলমাল। দেশটা আমাদের, না ওদের? পঞ্চান্ন কোটি লোকের মধ্যে আমরা যারা বাহান্ন কোটি লোক মার খাচ্ছি, দেশটা তাদের, নাকি ঐ তিন কোটি লোকের — মালিকশ্রেণীর এবং মালিকদের দালালদের? উৎপাদন, অর্থাৎ দেশের সম্পদ আমরা বুকের রক্ত জল করে বাড়াই, নাকি ওরা টাকা 'ইন্‌ভেস্ট' (বিনিয়োগ) করে বলে উৎপাদন বাড়ে? এইটিই হচ্ছে আসল, মূল প্রশ্ন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমি আপনাদের যে কথাটা বোঝাতে চাইছি, তাহল — বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধ আজ আর দেশকে বড় করতে পারে না। স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা জীবনে পা বাড়ায়নি, কংগ্রেসি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেইসব দেশদ্রোহীদের আড্ডা কংগ্রেসে হয়েছে। এরাই সব আজ রাতারাতি বড় বড় দেশসেবক হয়ে পড়েছে। তাই আমরা কংগ্রেসি নেতাদের জনজীবনের সামনে, ছাত্রদের সামনে আদর্শের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরতে দেখি কাদের? — সুব্রত মুখার্জী, জেনারেল থিমায়া, আর জেনারেল চৌধুরী। এই তিনটি 'মহাপুরুষ'ই (!) স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ছিলেন ব্রিটিশের ঘৃণ্য 'ল্যাকি' (দালাল)। দেশের যুবকরা যখন লড়েছে ব্রিটিশের বন্দুকের সামনে, তখন ওরা ছিল ওদের সৈন্যাধ্যক্ষ। ওদেরই পরিচালনায় ভারতবর্ষের সৈন্য এবং পুলিশ গুলি চালিয়েছে দেশের স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের উপর, দেশের জনসাধারণের উপর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যদি দেখতাম সুব্রত মুখার্জী, জেনারেল চৌধুরীরা তাদের ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাদের রাইফেল ঘুরিয়ে ধরেছে, তাহলে বুঝতাম তারা 'হিরো'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা ব্রিটিশের দালালি করেছে আজকের যুবকদের বলা হয় তাদের মতো হতে, বলা হয় বাংলার গৌরব সুব্রত মুখার্জী, জেনারেল চৌধুরী*। আমি বলি,

---

* *এমনকী মার্কসবাদী বলে পরিচয়দানকারী আর এস পি দলের মুখপত্র গণবার্তা, জেনারেল চৌধুরী যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর (মার্সিনারি আর্মি) সর্বাধিনায়কের (কমান্ডার-ইন-চিফ) পদ অলংকৃত করেন, তখন বাংলার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বলে একদিকে উল্লাস প্রকাশ করে ও অপরদিকে বিশেষ করে জেনারেল চৌধুরীকে 'বাংলার গৌরব' বলে আখ্যা দেয় — প্রকাশক।*

সে বাংলা ডুবলো বলে। সে বাংলার আর উপরে উঠবার উপায় নেই। ওরা বলে না ক্ষুদিরামের মতো হও, ওরা বলে না যারা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল তাদের তেজে তোমরা জাগো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য কোন কিছুর তোমরা পরোয়া করো না। ওরা বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলে না। ওরা যুবকদের সামনে আদর্শের যে নমুনা পেশ করে সেগুলো হচ্ছে দুনিয়ার একেবারে ডাহা দাগাবাজ দালালদের নমুনা, অর্থাৎ চিরকাল যারা দালালি করে এসেছে — সেই সেনানায়কদের, মার্সিনারিদের নমুনা। তাহলে যুবকদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বে না কেন? স্বার্থপরতা বাড়বে না কেন? দেশের লোকের সামনে এই সত্য কথাটা তুলে ধরতে হবে যে, বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া দেশাত্মবোধ, বুর্জোয়া আদর্শবাদ বা মতবাদ — এসব আর ভারতবর্ষের শোষিত জনসাধারণকে পথ দেখাতে পারে না। তাই একদিন যে মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েও রাজনৈতিক আন্দোলনের কম্পনে শরৎচন্দ্র কেঁপেছেন, নজরুল কেঁপেছেন — আজকের সাহিত্যিকদের বুকে তার এতটুকুও আলোড়ন নেই, বুর্জোয়া মানবতাবাদের সেই বিপ্লবাত্মক চরিত্রই আর নেই। আজকের বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা হচ্ছেন ক্রিয়াহীন তাত্ত্বিক, উন্নাসিক, জীবনে নির্ঝঞ্ঝাট — মাঝে মাঝে আসর গরম করেন রবীন্দ্র ব্যাখ্যা করে, শরৎ ব্যাখ্যা করে, নজরুল ব্যাখ্যা করে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করার তোমার তখনই অধিকার থাকে যখন রবীন্দ্রনাথের বুকের বেদনাটা তুমি আজও বুকে বহন কর। যার মধ্যে সে যন্ত্রণা নেই সে কী শেখাবে? তাই নজরুল একদিন বলেছিলেন — যারা গোলাম তারা আবার শেখাবে কী? ছাত্ররা কী শিখবে? সবচেয়ে বড় শিক্ষা — লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মর্যাদাবোধ অর্জন করা, স্বাধীনতার চেতনা লাভ করা, স্বাধীন মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার শিক্ষা।

আজও কিন্তু কথাটা অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য অর্থে প্রায় সমান। আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা, শোষণব্যবস্থা, অত্যাচারী ব্যবস্থারই পরিপূরক। এ শিক্ষা গ্রহণ করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি তাকে কাজ লাগাতে পারেন, একমাত্র তখনই এ শিক্ষা নেবার মানে আছে। তা না হলে এ শিক্ষা গোলামির শিক্ষা; আর মনে রাখবেন, শেখায়ও গোলামরাই।

ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের সমাজ নতুন ভাবধারার জন্ম দেবার জঠর বেদনায় কাঁপছে। পুরনো আদর্শবাদ পচে গিয়েছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা, শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে স্বাধীনতা

আন্দোলনের যুগের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মূল্যবোধ, মানবতাবাদের মূল্যবোধ তার চরিত্র হারিয়ে আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন-শোষণের সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এইভাবেই প্রতি যুগেই এক একটা আদর্শ আসে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় — কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে যখন সমাজে নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন পুরনো স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবাদর্শ, নতুন ভাবাদর্শ গড়ে ওঠার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নতুন মূল্যবোধ, নতুন প্রয়োজনের উপর গড়ে ওঠা নতুন আদর্শবাদ তার সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে। লড়াই করে পুরনো ভাবাদর্শকে হটিয়ে দিয়ে তবে তাকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই ইতিহাসের নিয়ম। আজ বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত ভাবাদর্শ থেকে, মানসিকতা থেকে, গান্ধীবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। গান্ধীকে গালাগালি করা মানে গান্ধীবাদ থেকে মুক্ত হওয়া নয়। 'অহিংসা বাজে জিনিস' বললেই গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। মানসিকতায়, রুচিতে এবং চিন্তার জটিল প্রক্রিয়ায় গান্ধীবাদকে নির্মূল করার সংগ্রাম করতে হবে। এ দুরূহ বাধা যদি না যুবসম্প্রদায় লঙঘন করতে পারেন তাহলে গণমুক্তি, শোষিত জনসাধারণের সাথে এক হয়ে প্রচণ্ড বিপ্লবাত্মক গণআন্দোলন সৃষ্টি — কোনটাই করা সম্ভব নয়। তাহলে শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে লড়ছি — এরকম ভাবতে ভাবতেও আসলে শেষপর্যন্ত করবেন মালিকের দালালি। দেশের স্বার্থের নামে, জাতির স্বার্থের নামে, শেষপর্যন্ত করবেন মালিকশ্রেণীর গোলামি। তাই ভারতবর্ষে নতুন আদর্শবাদের দরকার। আমরা একটা 'ট্রান্‌জিশনাল ফেজ'-এর (যুগপরিবর্তন কালের) মধ্যে আছি। পুরনো আদর্শ পচে গিয়েছে, অথচ নতুন বিপ্লবী আদর্শ আজও জনতার কাছে পৌঁছায়নি। ফলে 'ফ্রাস্‌ট্রেশন' (হতাশা), ফলে 'ইন্‌ডিফারেন্স' (অনীহা)। তাই আজ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবনাধারণাকে জনজীবন ও গণআন্দোলনগুলোর মূলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর, এই কাজ করার সময়ে গণআন্দোলনে ভেজাল সমাজতন্ত্র আমদানি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কারণ, সমাজতন্ত্র — বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া নানা রকমের আছে। আমি যে সমাজতন্ত্রের কথা বলছি, এ সমাজতন্ত্র শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের শেষ পরিণতি সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণা সংবলিত সমাজতন্ত্র। এই নতুন আদর্শ, এই নতুন ভাবধারার জন্য আপনাদের লড়তে হবে। যুবকদের সামনে আপনাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যুব আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি হচ্ছে সমস্ত শোষিত

মানুষের দৈনন্দিন গণসংগ্রামগুলিকে নির্দ্বিধায় সমর্থন করে যাওয়া — কারণ, আমরা শোষিত মানুষের অংশ। দেশের স্বাধীনতার কোন মানে যদি থাকে, তা হ'ল, এই শোষিত মানুষগুলোকে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করা। এই তার একটিমাত্র মানে। তাই এই মানুষগুলোকে প্রতিদিন যে লড়তে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে — রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজের অন্যায় অবিচারের ক্ষেত্রে — তার প্রতিটি আন্দোলনে আপনারা হবেন সক্রিয় সমর্থক ও অগ্রগামী অংশ — এই আমি আশা করব। আপনারা তত্ত্ব আলোচনা করবেন, 'ডিস্‌কাশন' করবেন, লিখবেন কেবল তাই নয় — এগুলো তো করতেই হবে আদর্শকে সামনে তুলে ধরবার জন্য, সাথে সাথে জনগণের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে, শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের যে কোন আন্দোলনকে নির্দ্বিধায় বলিষ্ঠভাবে সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে। এই দু'টি কাজ যদি আপনারা একত্রে করে চলতে পারেন তবেই ভারতবর্ষে যুব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আছে। তবেই ভারতবর্ষের যুবকেরা আবার গণআন্দোলনের পুরোধা হিসাবে, ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তির পুরোধা হিসাবে দেখা দেবে। দেশের চেহারা পাল্‌টাতে থাকবে, সমাজের চেহারা পাল্‌টাতে থাকবে। যে যুবকদের সম্বন্ধে আমি এত আলোচনা করলাম, কিছু কিছু কটূক্তিও করেছি, আমি জানি, সেই যুবকদের চোখ-মুখ হাবভাব আচার-ব্যবহার সবকিছু আবার পাল্‌টাতে থাকবে। গোটা দেশে একটা অন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই যুব আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য।

সর্বশেষে, উপস্থিত যুববন্ধুদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।